বাংলা ট্রিবিউন

যৌনকর্মীরা নিপীড়নের শিকার হয় না?

আমিনুর রহমান১৮:৪১, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৬

সময়টা ২০১৪ সাল।আমি তখন স্নাতক পর্যায়ের গবেষণার জন্য মাঠ কর্ম করতে দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে যাওয়া আসা শুরু করেছি।আমার কয়েকজন বন্ধু এ বিষয়টি নিয়ে হাসি তামাশা শুরু করে দিলেন।আমি লক্ষ করলাম আমার যৌনপল্লীতে গবেষণা করতে যাওয়ার কথা খুব দ্রুতই পরিচিত মহলে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই আমাকে বোঝাচ্ছেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার গবেষণা করা ঠিক হচ্ছে না।আমার নিকট আত্মীয়রা যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন আমাকে এক প্রকার ধমক দেওয়া শুরু করলেন।তাদের প্রশ্ন হচ্ছে কেন, আমি এমন 'জঘন্য ও ফালতু' বিষয় নিয়ে কাজ করছি।'নষ্ট মেয়েছেলে আবার কোনও গবেষণার বিষয় হলো নাকি!' পরিচিত মহলের এমন মনোভাব, নিরুৎসাহ ও নিষেধজ্ঞা আমাকে গবেষণা থেকে বিরত রাখার চেয়ে বরং আমার কৌতূহলকে আরও বহুগু ণ বাড়িয়ে দিলো।আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম , কোন প্রক্রিয়ায় এই বিশেষ জনগোষ্ঠী 'নষ্ট', 'জঘন্য' কিংবা 'ফালতু' বিবেচিত হয়।কেনইবা তারা গবেষণার বিষয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে না!

বস্তুত যৌনপল্লীতে যাওয়ার আগে যৌনকর্মী এবং যৌনপল্লী সম্পর্কে আমার একটা পূর্ব ধারণা ছিল।এই ধারণাটা আমি আমার প্রবল মধ্যবিত্তীয় সামাজিক মূল্যবোধ থেকেই পেয়েছি।এই ধারণা আমাকে শিখিয়েছে 'যৌনকর্মী হচ্ছে তারা যারা টাকার বিনিময়ে যৌনসেবা বিক্রি করে।যৌনপল্লীতে তারা গেটে দাঁড়িয়ে থেকে খদ্দের ধরে'।সমাজ আমাকে আরও শিখিয়েছে যে –'এই গোষ্ঠী সমাজের জন্য অ ভিশাপ।তারা সামাজিকভাবে গোপন, প্রাইভেট, শৃঙ্খলিত ও শর্তায়িত বিশেষ চর্চাকে বিশৃঙ্খল করে তুলছে এবং সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে যুব সমাজকে বিকৃত করছে'।কিন্তু সামাজিক ধারণা আমাকে যা জানতে দেয়নি তা হলো তাদের প্রত্যেকের পেছনে একটা করে গল্প আছে যা তাদের প্রতি দিনকার নিরব অশ্রু বিসর্জনের কারণ ; যা তাদের প্রত্যেকের জীবন দুটি অধ্যায়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণ; যা তাদের উপার্জিত প্রতিটা অর্থের পেছনে হাজারো আর্তনাদের কারণ এবং যা তাদের খদ্দেরের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়া প্রতিটা মুচকি হাসির পেছ নের জমাট বোবা কান্নার কারণ।

আমি যখন গবেষক হিসেবে যৌনকর্মীদের কথ্য ইতিহাস জানতে শুরু করলাম তখন আমি নিজেকে 'বাস্তবতা' এবং 'সামাজিক নির্মিতির' ঠিক মাঝ বরাবর আবিষ্কার করলাম।ভীষণ দ্বিধান্বিত অবস্থা ও নানা প্রশ্ন আমার সামনে হাজির হতে থাকে।আমি বুঝতে শুরু করলাম 'গৎবাঁধা' ধারণা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং কখনও কখনও বাস্তবতাও নির্মাণের বাইরের নয়।আমি চাক্ষুষ দেখতে শুরু করলাম সমাজ থেকে আমি যে যৌনকর্মীকে জেনেছি তা নিছক গৎবাঁধা, তার সঙ্গে বাস্তবে দেখা এই যৌনকর্মীর জীবনের ভীষণ তফাৎ রয়েছে।আমি লক্ষ করলাম , যৌনপল্লীতে স্বেচ্ছায় কোনও নারী এই যৌনতা বি ক্রির পেশায় এসেছে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন নারীকে যৌনকর্মীতে পরিণত করা হয় , যার প্রতিটা ধাপে রয়েছে নিপীড়নের ভিন্ন ভিন্ন ধরন।গবেষণার তথ্যদাতাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম অধিকাংশ নারীই বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন।এক্ষেত্রে কিছু চক্র সক্রিয় ভূমিকা রাখে যেমন, দালাল, সর্দারনী এবং বাড়িওয়ালি।এছাড়া, এক্ষেত্রে নারী পাচার, দারিদ্র্য এবং সামাজিক বিচ্যুতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।মূলত সমাজ থেকে একজন নারীকে যৌনপল্লীতে আনার ক্ষেত্রে সরাসরি এই চক্র কাজ করে। একটা পর্যায়ক্রমিক ধারা পার করে একজন নারীকে এসব চক্র ঘুরিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে যৌনকর্মী হিসেবে পরিণত করা হয়, এই চক্রাকার প্রক্রিয়ায় দেশের ভেতর এটাও নারী পাচারের অপরাধের মধ্যে পড়ে।প্রথমে একজন দালাল নিজে অথবা অন্য কারও দিয়ে বিভিন্ন বয়সের নারীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে, চাকরি দেওয়ার নাম করে কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মূলত গ্রাম বা শহর থেকে নারীদের প্রতারিত করে। পরবর্তী সময়ে তাদের যৌনপল্লীতে এনে সর্দারনীদের কাছে বিক্রি করে দেয়।সাধারণত একজন নারীকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার মধ্যে বিক্রি করা হয়।

দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে সাধারণত দুই ধরনের যৌনকর্মী দেখা যায় যথা : 'ছুকরি' এবং 'স্বাধীন'।দালালরা অপহরণ করে এনে যেসব নারীকে সর্দারনীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, তারা মূলত সর্দারনীর কাছে বাঁধা পড়ে যায়।তাদের সর্দারনীরা সর্বদা নজরদারির মধ্যে রাখে।এমনকি ঘুমোতে বা গোস লের সময়েও তাদের বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়।এই ধরনের যৌনকর্মীদের বলা হয় ছুকরি।ছুকরিরা প্রতিদিন কতজন খদ্দের নেবে , কতটাকা উপর্জন করবে সব কিছুই সর্দারনীর ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে।তাদের উপার্জনের ওপর নিজেদের কোনও দখল নেই।সর্দারনী তাদের ভরণ -পোষণ দেয় আর বিনিময়ে তাকে দিয়ে উপার্জন করিয়ে নেয়।এভাবে কিছুকাল চলার পর এসব যৌনকর্মীরা ধীরে ধীরে অন্যদের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে এবং সর্দারনীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজতে থাকে।৬ মাস থেকে ১ বছর কিংবা তারও অধিক সময় পরে এই বন্দি নারীরা যখন জানতে পারে যে তাদের আর হারানোর কিছু নেই, তখন তারা পুলিশের কাছে নালিশ করে।পুলিশ সর্দারনীকে চাপ প্রয়োগ করলে সর্দারনীরা ওই নারীর ওপর থেকে কর্তৃত্ব তুলে নিতে বাধ্য হয়।তবে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্দারনীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়।অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিপীড়িত এসব না রী স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে অধিক সুদে টাকা নিয়ে পরিশোধ করে।বাস্তবে দেখা যায়, এই সুদের টাকাই এসব নারীদের ওপর নতুন এক ধরনের আর্থিক শৃঙ্খল তৈরি করে।তারা প্রচুর টাকা উপার্জন করলেও সুদের দেনা -পাওনা শোধ করার পর দিন শেষে নিজেদের খাবারের টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খায়।

যৌনপল্লীতে নারীদের জীবন বহুমাত্রিক সহিংস নিপীড়নের শিকার।অপহৃত হওয়ার দিন থেকে শুরু আর মৃত্যুর পরেও তাদের ওপর নিপীড়ন চলতে থাকে । অপহরণকারীরা ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক নিপীড়ন করে।এরপর সর্দারনীর হাতে আসার পর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের মাধ্যমে এসব নারীদে র খদ্দেরের কাছে যেতে বাধ্য করা হয়।খদ্দেররাও নানা সময়ে নিপীড়ক হয়ে ওঠে।প্রভাবশালী খদ্দেররা এসব নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও যৌনকর্ম করতে বাধ্য করে, নেশাগ্রস্ত খদ্দেররা গায়ে মদ ঢেলে দেওয়া কিংবা শারীরিকভাবে মারধর করাসহ নানান নিপীড়ন করে।অথচ এসব নারীরা না পায় বিচার, না পায় কোনও সহযোগিতা।

আদতে, যৌনকর্মীর ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের বিচার না হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সামাজিক প্রবল ধারণায় যৌনকর্মীর ধর্ষণ কিংবা যৌন নি পীড়নের বিষয় স্বীকারতো হয়ই না বরং হাসি তামাশার বিষয়ে পরিণত হয়।তাদের প্রতি এমন ধারণা যৌনকর্মীর ওপর যেকোনও ধরনের যৌন নিপীড়নের আশঙ্কাকে খারিজ করে দেয়।বস্তুত, সামাজিক ভাবনাটা এমন যে, যে নারীরা টাকার বিনিময়ে যৌন সেবা বিক্রি করছে তারতো ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়ন হতে পারে না।কিন্তু এর আড়ালে তাদের যে অসম্মতি, অপারগতা, বাধ্যবাধকতা কিংবা অসহায়ত্ব তার কোনও দৃশ্য মানতা কিংবা সামাজিক স্বীকৃতি সামাজিক ধারণায় ঠায় পায় না।আর এভাবেই যৌনকর্মীদের জীবন বহুবিধ নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হলেও এই বাস্তবতা আড়ালেই থেকে যায়।

লেখক: গবেষণা সহকারী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ